আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস

সন্দীপ দত্ত

লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র - আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস

জ্বাবাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জগতে 'সন্দীপ দত্ত' নামটি কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। এই মানুষটি তাঁর জীবনকে অবিচ্ছেদ্য ভ াবে বেঁধে নিয়েছেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সঙ্গে। তাঁর তৈরী 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র' এক মণি-মাণিক্যের দূর্লভ ভ াণ্ডার। এই লাইব্রেরির গড়ে ওঠার ইতিহাস নিয়েই এই লেখা। এই সংখ্যায় থাকছে এরই প্রথম পর্ব। ৰ

ক বিতা লেখা দিয়েই সাহিত্যের হাতে-খড়ি। শশব-কৈ শোরের দিনগুলোতে গল্প বা ছড়ার বই হাতে পেলেই তাম পড়তাম গোগাসে। ম ামাবাড়িতে গেলেই 'রুশদেশের রূপক থা', 'দাদুর দস্তানা' এইসব রঙীন ছবিওলা বইগুলোর মধ্যে ডুবে থাক তাম। বাবা প্রতিবছরই দেবসাহিত্য ক ুটিরের 'শ্যামলী', 'বেণুবীণা', 'মনোরমা' নামের. ঢাউস মোটা মলাটের সচিত্র পুজোবার্ষিকীগুলো আমাদের উপহার দিতেন। তাই নিয়ে চলতো আমারে দুইভাইয়ের ক াড়াক াড়ি - কে আগে পড়বে। এগারো-বারো বছর বয়সে লেখালেখির শুরু। তখন ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হয়েছে - তাই নিয়ে দেশপ্রেমের সদীপ্ত ক বিতা, প্রকৃতি নিয়ে ক বিতা - এইসব আর কী। সে সব ক বিতার পাঠক -পাঠিক া (কি ংবা শ্রোতা) ছিলেন বাবা, মা, মাসিরা, মামাতো দিদি আর পাড়ার কি ছু দাদা। শুনিয়েই আনন্দ। কৈ শোরের সেইক বিতা গল্পের খাতা আমার ক াছে এখনও সযত্নে রক্ষিত।
১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে 'বর্তিক া' নাম দিয়ে এক টা দেওয়াল পত্রিক া প্রক াশ ক রেছিলাম - প্রথম বছর মাসিক হিসেবে, পরে ত্রৈমাসিক হিসেবে, ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত প্রক াশ ক রেছিলাম। বেশ কি ছু বিশেষ সংখ্যা প্রক াশ পেয়েছিল - রবীন্দ্র সংখ্যা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংখ্যা, অঙ্ক সংখ্যা, ভ্রমন সংখ্যা, চিত্রালী সংখ্যা, উত্তমক ুমার সংখ্যা, রাজেশ খান্না সংখ্যা, বিভূতিভূষণ সংখ্যা - এইরক ম আরো কী। ঐ বছর ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে পাড়ার ক ালী পুজোর সযভেনিরে আমার লেখা ক বিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরোয় - ক বিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর বরফি প্যাটার্ন আঙ্গিক ছন্দানুসারে লেখা 'এক া'। সে যে কী আনন্দের মুহূর্ত!। এভাবই সাহিত্যের বীজবপন শুরু।

সাহিত্য পত্রিক া সংগ্রহের ইচ্ছেটা আরো পরে জাগলেও এই সময়ে অনেক ক ষ্টে জমানো টিফিনের পয়সায় কে বনা পত্রিক া আমার ক াছে আজো আছে । তেমন ভবে তখন বুঝ তামও না এর আসল গুরুত্বটা কে াথায়। ক বিতা লিখি, গল্প লিখি, ক বিসভায় গিয়ে ক বিতা সুনে আসি। আজো বেশ মনে আছে মহাবোধি সোসাইটি হলে (স্টুডেন্টস হলও হতে পারে) আয়োজিত এক টি ক বিসভায় নির্দিষ্ট সময়ের কি ছু আগে উপস্থিত হয়েছি। শূন্য হলে হাফ -প্যান্ট পরা বালক কে দেখে উদ্যোত্তাদের মধ্যে এক জন জিজ্ঞেস ক রলেন 'তুমি কী কে ানো ক বির ভাই ?' দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলাম আমি ক বিতা লিখি'।
স্কুলের (সেন্ট পলস) বার্ষিক পত্রিক ায় গল্প, ক বিতা প্রক াশ পেল। মনে হল এই তো ক বি হয়ে গেছি।

১৯৬৯ সালে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমাদের বাড়ির গৃহভৃত্য আমাকে লেখালেখি করতে দেখে জানায় যে ওর এক বন্ধু অ াছে সে লেখে, বইটই বার করে। আমার সঙ্গে একদিন আলাপও করিয়ে দিল ওর গ্রামের বন্ধুর সঙ্গে। নাম বসন্তকুমার জানা, বাড়ি মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার উত্তর করেঞ্জি গ্রামে। কলকাতার কলেজ রো-র একটি বাড়িতে কাজ করে এবং কবিতা গল্প লেখে ও পত্রিকা বার করে। পত্রিকার নাম 'তিলোত্তমা' । আমাকে সদ্য প্রকাশিত ও আগের কয়েকটি সংখ্যা দিয়ে লেখা কিছু জোগাড় করে দিতে বলেছিল। আমি অবাক। পত্রিকাটির ৮ টি সংখ্যা বেরিয়েছিল সবশুদ্ধু । পত্রিকার ছাপার জন্যে কম্পোজিং টাইপ কিনেছিল। নিজে অবসর সময় কম্পোজ করে কলেজ রোয় বাসন্তী প্রেসে ছাপতে দিয়ে আসত। এরকম উদাহরণ বোধহয় একমাত্র। ২২ বছরের গৃহভৃত্য কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত তিলোত্তমা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণজ্জ্বল ঘটনা। পরে ছেলেটিকে খুঁজেছি অনেক। ও তখন কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। ১৯৮৭ সালে আমার 'প্রসঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন' বইটি বসন্তকে উৎসর্গ করি। উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে 'বসন্তকুমার জানাকে ১৯৬৯ সালে এই শহরে যে গৃহভৃত্যটি একটি পত্রিকার জন্ম দিয়েছিল'।
১৯৮৮ সালের জুনমাসের প্রথমদিকে ওর সঙ্গে আকস্মিক দেখা হয়ে গেছিল। লাইব্রেরিতে এসেছিল। প্রায় ১৭ বছর পরে দেখা। ওকে

আমার বইটি তুলে দিলাম। ওকে ওর কৈশোরের পত্রিকাগুলি দেখালাম। সে দেখে ও ওর আনন্দ চেপে রাখতে পারে নি।
এর মধ্যে স্কুল ছেড়ে কলেজে (স্কটিশ চার্চ কলেজ) ভর্তি হলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে। ১৯৬৯-১৯৭০ সাল হবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা তখন তুঙ্গে। নকশাল বাড়ি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। 'বুর্জোয়া শিক্ষা নিপাত যাক' 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস,' 'সত্তর দশক মুক্তির দশক' নানান স্লোগানে মুখরিত কলকাতা -- দেওয়ালে দেওয়ালে মাও সে-তুং এর স্টেনশিলে কালো রঙের টুপি পরা মুখাকৃতি। কলেজ পথে হাত দেখে পুলিশ হাত ঢুকিয়ে দেখে। তখন ১৮ বছর বয়স মানেই স্ফুলিঙ্গ। ' দেশব্রতী' সংগ্রহ করেছিলাম -- রাখতে পারেনি। বোমা, গুলি, মৃত্যু রাইফেল ছিনতাই, জোতদার খুন, গণ টোকাটুকি, ছাত্রসংঘর্ষ এসব চলতে থাকে। পত্রিকার স্টলগুলো মিনি পত্র-পত্রিকায় ভরে যায়। ১৯৭১ সালের গোড়ায় 'পত্রপুট ' নামে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও সাহিত্যবন্ধু আশু মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতায়। পত্রিকা প্রকাশের ঠিক আগের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। নতুন পত্রিকা বেরোচ্ছে। উৎসাহের শেষ নেই। প্রায় সারা দিন কাটে প্রেসে ছাপা হচ্ছিল পাইকপাড়ার দত্তবাগান অঞ্চলে চঞ্চল প্রেসে। এক সন্ধ্যায় বসে আছি প্রেসে। অন্নদা মুন্সীর কৃত প্রচ্ছদ লিপির ছাপার কাজ চলছে। হালকা ছাইরঙা মলাটের ওপর চকলেট পত্রিকার নামাঙ্কন। লাল আর কালো রঙ মিশিয়ে চকলেট রঙ তৈরী করার প্রস্তুতি চলছিল। ঝুঁকে দেখতে গিয়ে লাল কালি লাগল আমার সাদা প্যান্টের ওপর। সেই মুহূর্তে সেই লাল কালিকে আর প্রেসের লাল কালি নয়, মনে হচ্ছিল এক দলা রক্ত। এক ধরনের আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করেছিল। প্যান্টে যে অংশে লাল কালি লেগেছিল সে জায়গায় হাত দিয়ে চাপা দিয়ে কোনোক্রমে ২ নম্বর দোতলা বাসে উঠে পড়লাম। তখন মনীন্দ্র রায় রোড দিয়ে বাস চলত। দত্তবাগান তেকে কলেজ স্ট্রিটে বাড়ি আসার পথে যে কী অস্বস্তিতে ভুগেছিলাম।

পত্রিকা সম্পাদক হওয়ার সুবাদে খামে ভরে লেখা আসতে লাগল। পত্রিকার সমালোচনাও বেরোলো কাগজপত্রে। কত অপরিচিত অজানা মানুষকে পত্রিকার মধ্য দিয়ে পেয়ে গেলাম। ১৯৭১-এর মাঝামাঝি পাড়ার দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে গিয়ে আলাপ হল দর্শক ও সময়ানুগ পত্রিকার সম্পাদক দেবকুমার বসুর সঙ্গে। সম্প্রতি ট্যামার লেনে ঝিঞ্জান বলে দোকান খুলে বসেছেন। চাঁদা চাইতে গিয়ে মাঝবয়স্ক এক দোকানীর 'তোমরা কে কবিতা লেখো' প্রশ্ন -- এ অভিজ্ঞতা একেবারেই অভিনব। বন্ধুরা সেদিন আমাকে উসকে দিয়েছিল। দেববাবু ক্রমে কখন দেবুদা হয়ে গেলেন। আমার সামনে অন্যজানালা খুলেগেল। ৯/৩ ট্যামার লেনের ছোট্ট ঘরের আড্ডায় প্রায় নিত্য যাই। লজ্জায়, সংকোচে বসে থাকি। স্বনামধন্য কবিদের কত কাছ থেকে দেখি -- উঠতি তণ কবিরাও আসেন। দূরদুরান্তের পত্রিকার সম্পাদকরাও আসেন। আলাপ হয়। ওই বছরই দেবুদা 'সময়ানুগ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। কবিতার মাসিক পত্রিকা। ১ম সংখ্যার জন্যে তুচ্ছতম কবির কাছ থেকে দেবুদা সাগ্রহে কবিতা চেয়ে নিলেন। পাতিরামে অনেক পত্রিকা দেখলাম। তখন কপিল নামে এক মোটাসোটা চেহারার গোঁফওলা হিন্দুস্তানী স্টল দেখত । সব পত্রিকা যে কিনতে পারি তা নয় -- তখন পত্রিকার দাম ১০ পয়সা থেকে শু করে ৫ টাকা পর্যন্ত। খুব বেশী দাম হলে দশ টাকা। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আড্ডা ইত্যাদিত চা-সিগ্রেটের পয়সা বাঁচিয়ে সম্ভবও হচ্ছিল না সমস্ত পত্রিকা সংগ্রহ করা। ছাত্র জীবনে যা হয় আর কী। কিছু পত্রিকা পাওয়া গেল শুভেচ্ছা বিনিময়ে।
তখন ন্যশনাল লাইব্রেরিতে নিয়মিত পড়াশোনা করতে যেতাম। ১৯৭২ সালের মে মাসের কোনো এক দিন একটি অন্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। পত্র পত্রিকা চাইতে গিয়ে পেলাম না। লক্ষ্য করলাম লিটলম্যাগাজিনের কোনো উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থাই নেই। জাতীয় গ্রন্থাগারের বাংলা বিভাগে যাওয়ার প্রবেশ পথের সামনে করিডরে একদিন লক্ষ্য করলাম অসংখ্য পত্র পত্রিকা বেঁধে জড়ো করে রেখে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে উপযুক্ত জবার পেলাম না। তখন বাংলা বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন নচিকেতা ভরদ্বাজ। ওনার কাছ থেকে জানলাম যে অনিয়মিত বেরোনোর জন্য ও বাঁধাইয়ের অসুবিধের কারণে এই পত্র পত্রিকাগুলি রাখা হবে না। মনের মধ্যে চিৎকার করে উঠলাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল । এতো অমাকে অপমান। নিজেও তখন পত্রিকা বার করছি। ঘেন্নায় লাইব্রেরি থেকে চলে এলাম। জুলাই মাসে বি এ পার্ট টু পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার পর অখন্ডঅবসর। ন্যাশানাল লাইব্রেরির কথা মনে পড়ল। মনের মধ্যে দহন ঘটাল। কী করা যায় ভাবছি। লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রদর্শনীর কথা মাথায় এলো। আমদের একটি ক্লাবের ব্যানারে বাড়ির নীচে (আজ যেখানে লাইব্রেরি) একতলার দুটি ঘরে ৭৫০ টি পত্রিকার প্রদর্শনীর আয়োজন করলাম। নিজস্ব সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হল প্রদর্শনীর জন্য পাঠানো বিভিন্ন পত্রিকা। ১৯৭২ সালের ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ৫ দিন ধরে চলেছিল লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী। প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল বর্ণময় টাটকা ফল ও সবজী দিয়ে -- সাজিয়ে ছিলেন আমার একান্ত প্রিয় মানুষ শুভাদা - শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। প্রদর্শনী সূত্রে আলাপ হল পত্রিকা বন্ধুদের সঙ্গে। কফিহাউসে যাতায়াত শু তখন থেকেই। লেখালেখিও এগিয়ে চলল। ১৯৭৪ এ 'কোলাজ' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলছে। এই সময়ে নাটকে খুব বেশী করে জড়িয়ে পড়ি। নাটক দেখা তো চলতই। 'শৈলুষ' নামে একটা গ্রুপ করি। এর মূল দায়িত্বে ছিলেন প্রয়াত তণ গল্প লেখক বিকাশ জানা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকরির চেষ্টা চলছিল। একটি ছোট্ট সংবাদপত্র অফিসে ট্রেনি হিসেবে কাজ করতে থাকি। 'পত্রপুট' বেরোচ্ছে নিয়মিত। ১৯৭৮ সাল নাগাদ, যেখানে কর্মরত ছিলুম সেই কাগজে একটা লেখা লিখলাম 'ইন্দিরা প্রশাসনে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহ

াস'। ২৩ ও ২৪ জুলাই দুটো কিস্তিতেথ্যপঞ্জীটি বেরোলো। এটি আমার প্রথম তথ্যপঞ্জীর কাজ। কাগজটির মালিক ছিলেন উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি। কংগ্রেসী কাগজে ইন্দিরা বিরোধী লেখার জন্যে ধমকও খেলাম মালিক তথা সম্পাদকের কাছে। আসলে লেখাটি ছিলো জরী অবস্থার বিদ্ধে প্রতিবাদ।

এইসময়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মেদিনীপুরের এক স্কুলে পার্ট টাইম চাকরির অ্যাপ্লাইকরি। যেদিন ইন্টারভিউ সেদিন কলকাতা বর্ষায় ডুবছে। ওই অবস্থাতেই গেলাম। ওই স্কুলে চাকরিটি পাই। যা বেতন পেতাম সামান্য সেই টাকায় পত্রিকা স্টল থেকে লিটল মাগাজিন কিনতাম। কতই বা কিনতে পারি? ইচ্ছে হলেও পারি না। শুধুমাত্র লিটন ম্যাগাজিন কিনব বলে ৪ ঘন্টা যাতায়াত করে পার্ট চাইম স্কুল চাকরি করি। লোকে পাগল বলত। সব ক্রেতার পক্ষেও সব কাগজ কেনা সম্ভব হয় না। এই সব অমূল্য সাহিত্য পত্র যে যার ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে যাচ্ছে। অনেক মূল্যবান লেখায় ভরা কাগজগুলো এক জায়গায় পাওয়াও যাচ্ছে না। পত্রিকা করা, সাহিত্যের আড্ডা, লেখালেখির ফাঁকে উঁকি মারে ওই চিন্তা, এই যে কষ্ট করে এত কাগজ প্রকাশ পাচ্ছে এর অন্তিম গতি কোথায়? কোথায় যাচ্ছে এইসব পত্রিকা। জাতীয় গ্রন্থাগারের উপেক্ষা দেখে এসেছি। তাহলে! এইসব চিন্তারই বিস্ফোরণ ঘটল ১৯৭৮ সালে। ওই বছর জানুয়ারী মাসে আমাদের পাড়ার একটি ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তি বর্ষে লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী করি। প্রবাহ কবি সম্মেলনেও একটি পত্রিকা প্রদর্শনী করি। সাধারণ মানুষকে এ সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করি। এইভাবেই একদিন ভাবতে বসি আমার সংগৃহীত পত্রিকা দিয়েই তো শু করা যেতে পারে শুধু পত্র পত্রিকারই লাইব্রেরি। এই সময়ে মিনি পত্র পত্রিকার ইতিহাস ও পঞ্জি তৈরী করি। যাইহোক ১৯৭৮ সালের ২৩ জুন বাড়ির একতলায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করি। মার রান্নাঘর থেকে ব্যাক টেনে নিয়ে এসে ডাল-মশলার বদলে লিটল ম্যাগাজিন রাখি। ২০০০ কপি পত্রিকা নিয়ে শু হয় লাইব্রেরির কর্মকান্ড। লাইব্রেরির নাম দিই 'বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগাব. ও গবেষণা কেন্দ্র'। সংগ্রহের কাজে মন দিহ্য পত্রিকা কেনা ও জোগাড় তলতে লাগল। দেবুদার বন্ধু, রমাপ্রসাদ দত্ত প্রাথমিকভাবে সাহায্য করলেন পত্রিকা দিয়ে। পরবর্তীকালে তুষারকান্তি দে, ঋষিণ মিত্র, অজয় নাগ, প্রভাত কুমার দাশ, গৈরিকা চক্রবর্তী, তাপস ভবাই, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অণ মিত্র, রমেন্দ্র প্রসাদ মল্লিক, সোমা মুখোপাধ্যায়, হেমপ্রভা দেবী প্রমুখ অনেকেই লাইব্রেরিকে পত্রিকা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৭৯ সালের ৮ মে 'পত্রপুট' পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় ঘোষণা করে পাঠককে আহ্বান করি। যদিও ১৯৭৮ সালে ২৩জুন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা তবু ১৯৭৯ সালের ৮ মের তাৎপর্য আলাদা। এই দিনটিতে ব্যক্তিগত লাইব্রেরিকে সাধারণের কাছে উন্মুক্ত করি। যে মুহূর্তে সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইব্রেরির সম্পর্ক স্থাপিত হল, সেই মুহূর্তে লাইব্রেরির হৃৎপিন্ডও স্থাপিত হল। সেই শু। পত্রপুট নামক একটি চটি কাগজে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিপুল ধারায় পাঠক এসে গেল, তা নয়। প্রথম স্তরে সাহিত্যের বন্ধুরাই এলেন। আড্ডা পর্যায়েই চলছিল। আসলে ব্যাপারট সবার কাছে বোধগম্য হচ্ছি না। পাঠক আসুক, না আসুক নিয়মিত লাইব্রেরির দরজা খোলা হত। তখন শুধু মাত্র বরিবার সকালে দুপুরে আর মঙ্গল, বুধবার সন্ধেবেলা লাইব্রেরি খুলতাম। ওই বছরই অক্টোবর মাসের ২ তারিখে সাহিত্যানুরাগী বাবাকে হারাই।

এইভাবে কেটে গেল আরো একটা বছর। স্কুলের পার্ট-টাইম চাকরিটা ছেড়ে দিলুম। ১৯৮১ সালে সিটি কলেজ স্কুলের শিক্ষকতায় যুক্ত হলুম। এর মধ্যে বিয়েও হয়ে গেল। পত্রিকা নিয়মিত কেনা চলছিল একটু বেশি ভাবেই। মাইনে থেকে একটি অংশ পত্রিকা কেনার জন্যে রেখে দিয়ে তা থেকেই পত্রিকা কেনা চলত। ১৯৮১ সালে পত্রিকাপঞ্জি কর্মের কাজ শু করি পত্রপুটে। এই যে বিভিন্ন লিটন ম্যাগাজিনে গুত্বপূর্ণ লেখা লেখি প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলির বিষয়বস্তুর ক্যাটালগিং। একদিন একরাত্রি জেগে রবীন্দ্রনাথের ওপর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পত্র পত্রিকা থেকে যাবতীয় নিবন্ধের সূচী তৈরী করি। শুধুই প্রবন্ধের তালিকাপঞ্জি। কোন লেখা, কার লেখা, কোন পত্রিকার কোন সংখ্যায় কবে প্রকাশ পেয়েছে তারই তালিকা। পাঠককে এইসব প্রবন্ধ পড়ার আহ্বান। পত্রপুট-৯ এভাবেই বেরোলো। একটি ঘোষনায় জানালাম 'পত্রিকা - পাঠক- পাঠাগার সংযুক্তি আন্দোলন।' এই পত্র পাঠকও এলো কাজ করতে। সংবাদ পত্রের সমালোচনায় অকুণ্ঠ সমর্থন পেলাম। চিঠি পেলাম শিবনারায়ণ রায়, অধ্যাপিকা তান-ওয়েনের। গবেষকরা উৎসাহিত হলেন। তখন পাঠক এলেই এক পেয়ালা চা পাঠকের হাতে তুলে দিতাম পাঠক আসার আনন্দে। অশোক মুখোপাধ্যায় নামে এক তণ ব্যাঙ্ক কর্মী এলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও আমি' লেখাটির খোঁজে। 'আরো' পত্রিকা প্রকাশিত ওই লেখাটি পেয়ে খুশী হলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার কড়চা'র জন্য লিখলেন লাইব্রেরি নিয়ে সেটি প্রকাশিত হলো ওই বছর ১৬ জুন 'ছোটই সুন্দর' শিরোনামে। কিছু মানুষ এলেন 'যাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে আসি' মনোভাব নিয়ে। আবার কেউ কেউ গলি ঘুঁজি খুঁজে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। পেলাম অণ ভট্টাচার্য, 'উত্তর সুরি' পত্রিকার সম্পাদকের দীর্ঘ চিঠি। ২৮ জুন আজকাল দৈনিক পত্রিকায় লাইব্রেরির ছবি বেরোলো। নিচে ক্যাপসন 'কলকাতার প্রথম ও একমাত্র লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি'। পত্রপুট ১০-এ প্রকাশ করলাম (অক্টোবর ৮১) লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক ৬৫০ প্রবন্ধের সূচি। এ বছরই Visitors' Book চালু করলাম -- লাইব্রেরিতে প্রথম এলে নাম স্বাক্ষর ও তারিখ দেওয়ার রীতি ১৯৮১র জুন মাস থেকে চলে আসছে। প্রথম নাম আছে দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের যিনি এখন 'আজকাল' পত্রিকার লাইব্রেরিয়ান। পত্রপুট ১১ সংখ্যায় লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কবিতা বিষয়ক আলোচনার বিশদ সূচি

প্রকাশ পেল। বইমেলায় নিয়মিত অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, গবেষককে বোঝাতে লাগলাম এই সমস্ত ছোট কাগজের গুত্বট া কোথায়। পঞ্জির কাজ করতে গিয়ে সমস্যাটা দাঁড়াল অর্থনৈতিক। বিজ্ঞাপন প্রায় না পেয়ে পকেটের পয়সায় কাগজ চালালে যা হয় আর কী। তবু কী যেন দায় চেপে বসেছে। এটা করতেই হবে -- এতো লাইব্রেরিরই একটা অংশ। লাইব্রেরির কাজে মেতে লেখালেখি প্রায় বন্ধ। এখন শুধু চিন্তা লাইব্রেরির কাজকর্মে জোয়ার আনা। ডাকে নিয়মিত পত্রিকা আসতে লাগল। পত্রিকা পেলাম সম্পাদকদের কাছ থেকে। র‍্যাক দিয়ে পত্রিকাগুলো সাজানো থাকত সারা ঘরে। স্টীলের র‍্যাক নিলাম। তাতে পত্রিকা গুলো বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে দিলুম। ১৯৮৩ সালে লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গবেষণার কাজ করব ভাবি -- বিভিন্ন পড়াশোনার মধ্য দিয়ে নোট নিতে থাকি। বিশ্ববিদ্য ালয়ের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ আমার গবেষণার বিষয় শুনে এমন ভাব করলেন যেন এ আবার কী। না না করে একরকম আমায় ভাগিয়ে দিতে চান -- নাছোড় বান্দা দেখে আমাকে এ নিয়ে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেখাতে বললেন। দেখালাম। কাকস্য পরিবেদনা। প্রত্যাখ্যাত হল গবেষণার প্রস্তাব।

লাইব্রেরি বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবি। যত দূর-দূরান্তের চিঠি আসত তাদের কাছে আবেদন রাখলাম, আপনার পড়ার ঘরকে কিছুক্ষণ ছেড়ে দিন, গড়ে তুলুন লিটল ম্যাগাজিল লাইব্রেরি। বিভিন্ন সভায় একই কথা উচচারণ কর বারবার এইভাবে কিছু কিছু গড়েও উঠল। পত্রিকা দিয়ে সাহায্য ও করলাম। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তা সাইনবোর্ড হয়ে গেল। তবু লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি আন্দোলনে এই নতুন সংযোজনাকে স্বাগত জানিয়ে অনেকেই শু করেছেন লিটন ম্যাগাজিন পাঠাগার। লিটল ম্যাগাজিনের নতুন পাঠক গড়ে তোলার উদ্দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শনী ও সেমিনারেরর কথা ভাি। ১৯৮৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভ াগে এর উদ্বোধন হল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন ডাঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরই যৌবনে সম্পাদিত 'জাগরণী' পত্রিকার ১ ম সংখ্যা স্পর্শ করে (সংখ্যাটি লাইব্রেরির সংগৃহীত)। সেমিনার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান প্রণবরঞ্জন ঘোষ। এক হাজার লিটল ম্যাগাজিনের ওই প্রদর্শনীটি সেদিন ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকরা উৎসাহের সঙ্গে দেখেন। পত্র পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করেন। সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন শংখ ঘোষ, পবিত্র সরকার, বার্ণিক রায়, উজ্জ্বল মজুমদার, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শৈল্পের ঘোষ, দেবকুমার বসু, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠক - অন্বেষার ক্ষেত্রে প্রদর্শনীটির গুত্ব উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীটি বাস্তবায়িত করতে স াহায্য করেছিলেন রমাপ্রসাদ দত্ত, অঞ্জন কুমার বন্দোপাধ্যায়, সুমিতা দাস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায প্রমুখ। বাংলা বিভাগের দেওয়াল ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, অ্যালান গিনসবার্গ, ইয়ান হ্যামিলটন, অ্যালেন-ডি-লোচ, লেসলি ফিডলার, হ্যারি স্মিথের মন্তব্যে। পত্রপুট ১২ বেরলো অক্টোবর ৮৩ তে নাটক বিষয়ক পঞ্জি হিসেবে।
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার (!) ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেনকে লাইব্রেরির কথা জানাতে উনি রীতিমতো খেপে গিয়ে বললেন, অ াপনি কেন শুধু শুধু পয়সা খরচ করে জঞ্জাল, রাবিস প্রশ্রয় দিচ্ছেন। লিটিল ম্যাগাজিন জঞ্জাল, রাবিস ইত্যাদি। পত্রপুট ১৩ বুলেটিন হিসাবে প্রকাশ পেল বইমেলায় সুকুমার সেনের ঐ মন্তব্য ছেপে। মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটল। প্রতিবছর বইমেলায় বুলেটিন প্রকাশ সেই থেকে বেরোচ্ছে। এই বুলেটিন লাইব্রেরী সংক্রান্ত বার্ষিক কাজকর্মের আলতামানি থাকে। ১৯৮৪-র শুতেই লাইব্রেরীর প্রকাশনা বিভ াগ চালু করি। নাম দিই 'হার্দ্য'। লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত ১৯ টি প্রবন্ধ নিয়ে সংকলন 'জীবনানন্দ প্র াসঙ্গিকি' সম্পাদনা করি। আর দুটি বই প্রভাত কুমার দাসের 'জীবনানন্দ দাশ জীবনীপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী' আর অচিন্ত কুমার সাঁতরার ছে াটগল্পের বই 'আশ্রয় ও অন্যান্য গল্প'। পত্রপুট ১৪ প্রকাশ পেল। বিষয় কবি জীবনানন্দ দাশ।
তখন লাইব্রেরী নির্দিষ্ট সময় খোলা থাকত - সোম, বুধ, শুত্র - সন্ধে ৭টা - ৯টা, মঙ্গলবার বিকেল ৪টা - ৬টা, শনিবার ২টা - ৫.৩০টা, রবিবার সকাল ৯টা - ১২টা। পশ্চিবঙ্গের নানা প্রান্তের মানুষজন আসেন। ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, গবেষক, সাহিত্য পিপাসু প াঠক এখানে এসে পড়াশুনো গবেষণার কাজ করে থাকেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা আসেন, আসেন সাংবাদিকতা বিভাগের ছ াত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অনুসন্ধানে, সাংবাদিকরা আসেন Ready reference-এর খোঁজে। নাটক, চলচিচত্র, সংগীত, আবৃত্তি, চিত্র-ভাস্কর্য, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন সাহিত্য, বিজ্ঞান, নানাবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এখানে ভিড় করেন। এদের মধ্যে যেমন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, তেমনি আছেন অধ্যাপক, গবেষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, পত্রিকা সম্পাদক, কবি, লেখক, নাট্যক ার, আলোচক, চিত্রশিল্পী - নানা শ্রেণীর পড়ুয়া।
লাইব্রেরীর কাজকর্ম সম্পর্কে ইতিমধ্যে সত্যযুগ, আজকাল, The Statesman, The Telegraph, যুগান্তর, Hindusthan Standard থেকে প্রকাশিত Asia Week-এ আলোচনা প্রকাশিত হল। বইমেলা ২৫ শে বৈশাখে জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্র সদন থেকে লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত কিনতে থাকি। পুরানো দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা সংগ্রহ চলল। কলেজষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, হাতিবাগান, হাইকোর্ট প াড়া, বিবাদি বাগে বইমেলায় পুরানো বই বেচা-কেনার স্টলে হানা দিয়ে এইভাবে পেয়ে যাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গ দর্শন' -এর ১ম সংস্করণ ১ম সংখ্যা সহ প্রথমবছরের বাঁধাই গোটা সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী ভারতবর্ষ, নারায়ন, সবুজপত্র, সাধনা ভ ারতী, সমালোচনী, মানসি ও মর্মবাণী, শনিবারের চিঠি, বিচিত্রা, আর্যদর্শন, সাহিত্য, জাহবী, বামাবোধিনী, পূর্বাশা, পঞ্চপুষ্প, গল্পগুচ্ছ

(পুরানো), পঞ্চস্বর, নতুন সাহিত্য, পরিচয়, সাহিত্য খবর, গল্প ভারতী, কৃত্তিবাস পত্রিকার ১ সংখ্যা থেকে ১২ ও অন্যান্য পরবর্তী সংখ্যা, সাহিত্য পত্র, উত্তরণ, উত্তরসূরী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত সমসাময়িক -এর ১ম ও ২য় সংখ্যা কমল কুমার মজুমদার সম্পাদিত অঙ্ক ভাবনা, সারস্বত, দৈনিক কবিতা, কবিতা সাপ্তাহিকী, অচলপত্র, সুন্দরম, সচিত্রভারত, এষা, বসুধরা, বসুমতি, অবসর, অর্চনা, বর্ণবাণী, চতুষ্পর্ণি, স্বাধীনতা, অগ্রণী, মুভী মনতাজ, রুপমঞ্চ -- এরকম অনেক পত্রিকা। এইসব পত্রিকা সংগ্রহ করার অভিজ্ঞতা বিচিত্র। মনে পড়ছে 'বঙ্গদর্শন' এর ১ সংখ্যা সহ ১ ম বর্ষের সংখ্যাগুলো পাওয়ার সেই রোমাঞ্চকর সন্ধ্যাটির কথা। সংগ্রহের তারিখ ২২ নভেম্বর ১৯৮৪। স্থান হাতিবাগান রূপবাণী হলের সামনে। ফুটপাতের পুরানো বইয়ের দোকান। বিষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। শ্যামবাজার থেকে কলেজস্ট্রীটগামী ট্রামে বাড়ি ফেরার পথে নেমে পড়লাম। স্টলের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংস্করণের ১ ম সংখ্যা দেখেই শিহরিত হলাম। আবেগ সংযত করে পানের দোকান থেকে অহেতুক সিগারেট কিনলাম। টান দিয়ে ফেলে দিলাম। আবার স্টলে নিতান্তই অবহেলায় জিগ্যেস করি 'কত হবে'? (যে কোনো অর্থ দিতে প্রস্তুত)। 'পনের' (ভুল শুনছি।) আবার জিগ্যেস করলাম, ঠিক করে বলুন'। 'বললুম তো পনেরো, রেয়ার কপি' (এত কম।) 'এত না, আমি ৮ টাকা দেবো।' শেষমেষ ১২ টাকায় পেয়ে গেলাম সেই অমূল্য রতন। এইভাবেই একদিন কলেজ স্ট্রিটের স্টল থেকে পেয়ে যাই 'এক্ষণ' এর কালমার্কস ও দান্তে সংখ্যা। বই বাজার থেকে ফালতু কাগজের ঝুড়িতে রাখা দুষ্প্রাপ্য 'কালপুষ' এর একাধিক সংখ্যা , হাতিবাগান অঞ্চলের বোস ব্রাদার্স স্টল থেকে 'মুভি মোনতাজ' এর প্রথম দিকের অনেক সংখ্যা নতুন সাহিত্য অগ্রণী, অঙ্কের কাগজ। আগে বইমেলায় বই বাজার হত। অসংখ্য দড়ি বাঁধা আলতু ফালতু ম্যাগাজিন, বইয়ের মধ্যে পাই সত্যজিৎ রায়, ঋতিক ঘটক প্রমুখ সম্পাদিত ''চলচিত্র'' ১ ম সংখ্যা।

১৯৮৪ সালের আমার বন্ধু শঙ্কর কে (মনীন্দ্র কলেজের বাংলার অধ্যাপক ডাঃ শিব শঙ্কর ঘোষ) লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রা করতে অনুরোধ করি। প্রতি বছরই প্রায় কলেজের প্রা পত্রে নানা ভাবে ও লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রা করেছে কখনো পত্রলিখন, কখনো বা রচনা। এই দেশের একাডেমিক অচলায়তনকে ভেঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনকে এভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যুক্ত করার চেষ্টা করে গেছি।

১৯৮৫ সালে বই মেলার পরই বিলাস পুরে ৫৬ তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে প্রথম লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী করি '' সেতু'' পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ ও 'মধ্যবলয়' পত্রিকার সম্পাদক শিবব্রত দেওয়ানজীর উৎসাহে। প্রদর্শনী প্রঙ্গনে লিটল ম্যাগাজিন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রতাপচন্দ্র চন্দ, সুদ্ধসত্ত্ব বসু, অমিতাভ চৌধুরি, মজহাল ইসলাম, আলি আনোয়ার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। বিলাস পুরে আমার সঙ্গী ছিলেন সাহিত্য সেবী তপন চট্টোপাধ্যায়। ঐ বছর ই কলকাতায় আবৃত্তিলোক আয়োজিত কবিতা উৎসবে কবিতা বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী করি। সেপ্টেম্বর মাসে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দুদিন ব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রদর্শনী ও আলোচনার আয়োজন করে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায়। ছাত্র ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শনী দেখেন ও তথ্য সংগ্রহ করেন। দুদিনে প্রায় ২৫০ টাকার লিটল ম্যাগাজিন বিক্রি হয়। আলোচনায় অংশ নেন ডি ন রাম্মের শ, অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ, ঋষিণ মিত্র, চমুক গোস্বামী প্রমুখ। অঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ও তপন চট্টোপাধ্যায় প্রদর্শনীতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৯৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এড. বিভাগে দুই বার প্রদর্শনী করি। এই অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রধান তণরঞ্জন মজুমদার, কবি অণ মিত্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বি.এড পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপকগণ আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শনীটি দেখেন। রামকৃষ্ণ মিশন (নরেন্দ্রপুর), চেতলা বয়েস হাইস্কুল (সোনারপুর)-এ লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী করি ঐ বছরই।

১৯৮৬ সালে লাইব্রেরির নাম পাল্টে 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র' রাখা হয়।

১৯৮৭ সালে মালদা বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনের জন্যে আহুত হই। প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী মালদা টাউন লাইব্রেরির সামনের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত প্রায় দেড় হাজার লিটল ম্যাগাজিনের এক প্রদর্শনী সংগঠিত করে লাইব্রেরি। লাইব্রেরির পক্ষে এই প্রদর্শনীতে সহযোগী হিসেবে ছিলেন দেবাশিষ দাশ ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য। গ্রাম বাংলায় নানা সময়ে প্রদর্শনী করেছি। এইভাবেই ছুটে গেছি বর্ধমান, হলদিয়া, উত্তরপাড়া, হুগলী, মালদা, বীরভূম উত্তর ২৪ পরগণা দক্ষিণ ২৪ পরগণার নানা প্রান্তে। সাধারণ মানুষের চোখের চামড়ায়, মননে পৌঁছে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

পত্রপুট ১৫ ও ১৭ র বিষয় যথাক্রমে লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক প্রবন্ধের বিশদ সূচী। এগুলিও সমাদৃত হল বিষয় গুণে। লাইব্রেরির প্রকাশনা থেকে বেরোলো দুটি বই ঃ 'জাগরী ঃ চরিত্র ও চেতনায়' লেখক -শংকর ঘোষ, বেরোলো প্রভাত কুমার দাসের 'আধুনিক বাংলা কবিতা, 'নিরন্ত' আন্দোলন'।

বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি মেলা উদ্যোক্তাদের উদাসীন্য উপেক্ষা ও অবহেলার প্রতিবাদে ১৯৮৭ সালের ৩১ জানুয়ারি চিরঞ্জীব সূরের লিটল ম্যাগাজিন গিল্ড ও লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে বেশ কয়েকটি দাবি-দাওয়া নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বইমেলা পর্যন্ত লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের একটি বিশাল মিছিল বেরোয়। আমরা আমাদের দাবি মেলার সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে পেশ করি। লিটল ম্যাগাজিনকে একটি তাঁবুর মধ্যে রাখা হতো। কোনো ঘোষণাও থাকতো না। আজ লিটল ম্যাগাজিন

বইমেলায় গুত্বের সঙ্গেই স্বীকৃত। আজও বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি কোনো উদাসীন্য বা অবহেলা দেখলে তার প্রতিবাদ নিয়ে থাকি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। বছর বইমেলায় আমার প্রসঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত সেই ১৯৮৩ সালে লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে যে লেখালেখির কাজ করি তার সঙ্গে আরো অন্য লেখা যুক্ত করে বইটি প্রকাশ করি। বাংলা ভাষায় লিটল ম্যাগাজিনের তত্ত্ব ও তথ্য বিষয়ক এটাই সম্ভবত প্রথম বই। আজ আনন্দ এখানে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গবেষণা করতে দেয়নি, আমিও পরবর্তী কালে আর করিনি। গবেষণা ওখানেই থেমে নেই। আজ লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, গবেষকরা লিটল ম্যাগাজিনকে কাজে লাগাচ্ছেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয় গুলি পড়াশোনার গবেষণার কাজে আমাদের লাইব্রেরির নাম রেফার করেন। লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রদর্শনী, মেলা, পুরস্কার, সংবর্ধনা কত কী হচ্ছে। এটাই ছিল ভবিতব্য তাই ঘটেছে। এমনটি কিন্তু ছিল না আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে। একেবারে শূন্যতা। লিটল ম্যাগাজিন মানেই ঘৃণ্য কোনো অদ্ভুত কোনো কিছু, বালখিল্যের সাহিত্যর নামে আদেখলেপনা কিন্তু তা যে নয় লিটল ম্যাগাজিনেই বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির মূল স্রোত এই বিশ্বাসটাই আঁকড়ে ধরে কাজ চালিয়ে গেছি ইচ্ছার বিরোধিতা সত্ত্বেও। ১৯৮৭ বইমেলা থেকে একটি টুপি মাথায় পরে থাকি যাতে লেখা থাকে 'লিটল ম্যাগাজিন পড়ুন, লিটল ম্যাগাজিন পড়ান, লিটল ম্যাগাজিন ভাবুন , লিটল ম্যাগাজিন পড়ান'। আজো বইমেলায় ওই টুপি পরে ঘুরে বেড়াই।

১৯৮৭-র ২৬ ডিসেম্বর চালু করলাম লেখক ব্যাঙ্ক ও লিটল ম্যাগাজিন ডাকঘর। উদ্বোধন করলেন লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী। লেখক ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের সঙ্গে পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না, সেইসব লেখকদের সঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আজ পর্যন্ত ১৮টি লেখার লেনদেন হয়েছে ' লেখক ব্যাঙ্কে'র মাধ্যমে (ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ)। এর মধ্যে প্রায় ১৩৩ টি লেখা প্রকাশ পেয়েছে। ৪৭টি লেখা অমনোনীত হয়েছে (মতামত সহ লেখকদের লেখা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।)

'লিটল ম্যাগাজিন ডাকঘর' শু হ'ল একটি উপায় হিসেবে। ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ডাকমাশুল বেড়ে যায়। এর জন্যে সবচেয়ে বেশী আর্থিক ঝুঁকি বাড়ে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের। এর বিদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই গড়ে তুললুম লিটল ম্যাগাজিন ডাকঘর। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকরা পত্রিকার লেখক কপি লেখকের নাম সহ লাইব্রেরিতে জমা দেন কলকাতা ও কাছাকাছি জেলার ক্ষেত্রে জমা দেন কোন উদিষ্ট গ্রন্থ কিংবা চিঠি। নির্দিষ্ট লেখক তাঁদের গ্রন্থ বা বার্তাটি লাইব্রেরির সময়ে এসে সংগ্রহ করে থাকেন। বলা যায় যোগসূত্র বা মাধ্যম হিসেবেই এটি কাজ করে থাকে। ডাক বৃদ্ধির বিদ্ধে পাল্টা প্রতিবাদ হিসেবেই গড়ে উঠেছে এই ডাকঘর।

১৯৮৮ র মার্চ মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবার্ষিকী ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র পত্রিকার একটি প্রদর্শনী করলাম। ৩০০ পত্রিকার ওই প্রদর্শনী দেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, উৎসাহী মানুষজন। সংসদের পক্ষে কৌশিক রায় চৌধুরী (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক) ১০০ টাকা লাইব্রেরির জন্য আমার হাতে তুলে দেয়। সেদিন ওই সাহায্যটুকু শুধু কৃতজ্ঞতার ভাষা দিয়েই শেষ করা যায় না। লাইব্রেরিতে তখন খরচা ও বাড়ছে -- পত্রিকা কেনা, বাঁধাইকরা, পেস্টিসাহড, র‍্যাক কেনা সবই চলে পকেট থেকে। পাঠকদের পড়ার জন্য নির্ধারিত চাঁদা ছিল না-ছিল একটা ফুটো ভাঁড়, নাম দিয়েছিলাম ফ্রি পেনি অপেরা। প্রতিদিন পকেটে যে খুচরো পয়সা ছিল তা ফেলতাম ওখানে, আজো ফেলি। পাঠকদের কাছে ছোট আবেদন ছিল পাঠ দিনপ্রতি ২৫ পয়সা। দেখতাম কেউ বা দু টাকা পাঁচ টাকা দশটাকাও ফেলতেন। যারা পুরনো পাঠক তাদের কেউ কেউ খোঁজেন সেই ফ্রিপেনি অপেরা, ফুটোয় পয়সা ফেলেন। সেদিক থেকে দেখলে প্রদর্শনী করতে গিয়ে পাওয়া ওই একশো টাকা অনেকটা।

ইতিমধ্যে মাথায় একটা চিন্তা এলো; ঠিক করলাম জাতীয় গ্রন্থাগারের যে মনোভাবের প্রতিবাদে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ভাবনার সূচনা, সেই গ্রন্থাগারে একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী করবো। তখন অধিকর্তা ছিলেন ডাঃ অশীন দাশগুপ্ত। বিশিষ্ট ভদ্রলোক - আমার সঙ্গে প্রথম আলাপন হয় কবিতা উৎসবের প্রদর্শনীতে। প্রথম সাক্ষাতেই ওনার জিজ্ঞাসা - ন্যাশানাল লাইব্রেরি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারে ? বলেছিলাম, লিটল ম্যাগাজিন আর তণ কবিদের বইগুলো যতাযোগ্য সংরক্ষিত হলেই হবে। উনি আমাকে যেতে বলেছিলেন ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে। ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডায়রেক্টরের এই আহ্বান আমাকে এক অন্য তৃপ্তি দিল - এতো লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিকেই সন্মান জানানো! আমি গেছিলাম ডায়রেক্টর অশীন দাশগুপ্তের কক্ষে। সেদিন নানা কথার মধ্যেই আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিনের একটি প্রদর্শনীর ব্যাপারে। উনি সানন্দে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে প্রধান গ্রন্থাগারিককে এ বিষয়ে চিঠি লিখে দিলেন। আমি প্রধান গ্রন্থাগারিক (শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়)-এর সঙ্গে দেখা করে ডঃ দাশগুপ্তর চিঠি দিয়ে প্রস্তাবটির কথা জানিয়ে বললাম 'জাতীয় গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিন তো তেমন নেই আমি আমার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসব?' উনি বললেন 'তা কী করে হবে!' এবং প্রদর্শনীর সেখানেই ইতি। আমার স্বপ্নভঙ্গ হল।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ দশবছর। এই সময় প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করি। কবি অণ মিত্র, মহাব্বতা দেবী রাজী হলেন আমার আবেদনে। ঠিক করলাম কবি বিনয় মজুমদারকে সংবর্ধনা জানাবো। ঠাকুরনগর শিমুলপুরের বাড়িতে বিনয় দাকে সেকথা জানালাম। গায়ত্রীকে কবিতার বইটা পাওয়া যাচ্ছিল না। বিনয়দার কাছেও নেই। আমার কাছে একটি কপি ছিল। ঠিক করলাম 'গায়ত্রী'কে পুনর্মুদ্রণ করব বিনয় মজুমদার সংবর্ধনার অন্ধ হিসেবে। বিনয়দা অনুমতি দিলেন সানন্দে। নৌকা পত্রিকার অমলেন্দু (বিশ্বাস) স্বাগত জান াল আমার প্রস্তাবকে।

২৩ জুন স্টুডেন্টস হলে লাইব্রেরিতে দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব। নিজের হাতে কার্ড বোঝাই থলি নিয়ে, পাঠকদের হাতে হাতে আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজে লাগলাম। সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। কলকাতা ও কাছাকাছি এক একদিন এক একটা এলাকা ঘুরে সরাসরি বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম আমন্ত্রণ পত্র। সাধ্যমত যতটা পেরেছি করেছি। ডাকেও চিঠি পাঠালাম বহু। সংব াদপত্র অতিথিদের আমন্ত্রণপত্র দিয়ে এলাম। বিনয়দার মানপত্র সাজিয়ে দিল কবি ও শিল্পী শ্যামলবরণ সাহা। 'গায়ত্রীকে', অনুষ্ঠানপত্র সবই ছাপা হয়ে গেল। আজকের মতো তখন কিন্তু আমার পাশে এতজন মানুষ ছিল না। নিজের হাতেই সব কাজ সারলাম। অনুষ্ঠানের দিন সকালে মেডিকেল কলেজ থেকে চেক আপ করিয়ে বিনয়দা বাড়িতে এলেন। স্নান, আহার সেরে বিশ্রাম নিলেন। আষাঢ় মেঘ রে াদ্দুর খেলা চলছে। বৃষ্টি পড়তে শু করল বিকেলে। অনুষ্ঠান শু হলো ঠিক সন্ধে ৬ঃ৩০-এ । হলে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাইরেও লোক দাঁড়িয়ে। মহাব্বতাদি উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। আমি স্বাগত ভাষণে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইমোশনালি কেঁদে ফেললাম। আমার দু বছরের শিশুপুত্র সামনে বসেছিল। ছেলেকে সময় না দিতে পারার অক্ষমতার কথা উচচারণ করে নিজেকে আর সংযত র াখতে পারে নি। অমিতাভদা (দাশগুপ্ত), পরিমল চক্রবর্ত্তী বক্তব্য রাখলেন। অণ দা বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানালেন কবি বিনয় মজুমদারকে স্বচক্ষে এই প্রথম দেখলেন। কবির হাতে মানপত্র মালা আর গায়ত্রীকে পুস্তিকাটি তুলে দিলেন প্রধান অতিথি অণ মিত্র। একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। বিনয়দার প্রিয় ফুল বকুল। বকুলমাল্য দিয়ে বরণ করা হবে। এই ঘোষণার পর কবিকে মালা পরিয়ে দেওয়া হতেই হলে হাসির আভাস। বুঝলাম মারাত্মক ত্রুটি হয়ে গেছে। আসলে হাওড়ার মল্লিক ঘাটে ফুলের হাট থেকে বকুল কিনতে গিয়ে অ াকন্দফুলের মালা শালপাতার মোড়কে নিয়ে এসেছিলাম। বিনয়দা অম্লানবদনে তাই গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরনগর থেকে এসেছিল অমলেন্দু তীর্থঙ্কর, বিষ্ণুরা। ওরাই সেদিন কবিকে নিয়ে ফিরেছিল। ঋষিনদা (মিত্র), অজিত দা (পান্ডে) প্রতুলদা (মুখোপাধ্যায়) সেদিন গান গেয়েছিলেন। আবৃত্তি করেছিলেন নীলাদ্রি শেখর বসু, মালি। সেদিন অনুষ্ঠান করতে যাদের সাহায্য পেয়েছিলাম তারা হলেন চিরঞ্জীব শূর, তপন চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিসদা, কাজলবাবু সুমিতা, মালবিকা, পুষ্পল, ত্রিদিবদা (বর্মন), সুচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি তুলেছিল ছাত্র শান্তনু বসু মল্লিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিল অঞ্জনদা (কর), ও অঞ্জন (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ওই বছরই সেপ্টেম্বরে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়িতে প্রদর্শনী করতে ছুটে গেলাম। আমার সঙ্গী হলেন ত্রিদিবদা আর বণ বসু। জলপ াইগুড়ি আনন্দ কমার্স কলেজে দুদিন ও শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু হলে প্রদর্শনী করেছিলেন। নানা স্থানে প্রদর্শনী আলোচনা নিয়মিত করে চলতাম। সুইডেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের মুখপত্র বিবিএল পত্রিকায় লাইব্রেরি সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। লাইব্রেরি স ম্পর্কে একটি তথ্যবাহী ইতিবৃত্ত 'খড়কুটো বাসার কাহিনী' লিখলেন 'কৌরব' পত্রিকায়। প্রখ্যাত আলোক চিত্রী রঘুবীর সিং এর কলক াতা সম্পর্কিত আলোক চিত্র অ্যালমবামে (ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত) ভূমিকায় রাধাপ্রসাদ গুপ্ত উল্লেখ করলেন লাইব্রেরির কথা।

১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরার আগরতলার অনুষ্ঠানে লাইব্রেরি অংশ নিল। আগরতলা প্রেস ক্লাবে লিটল ম্যাগাজিনের সম্প াদকদের কাছে বক্তব্য রাখলাম।

(ক্রমশঃ)